কবির বুক ও মাথা

রবি সেন

"ঢ্যাঙা, বেঁটে কবিরাও তোমাদের বিজ্ঞাপনে হেঁটে যাচ্ছে ; 'জাতীয় সংহতি' বা ঐরকমই একটা ইস্যুতে—"

এ কথায় সুমন্ত ফোয়ারার মতো হাসে, উদ্দেশ্যরঞ্জিত বা স্বভাবজনিত যাই হোক না কেন, বলে, "হোয়াটস্ দ্য হার্ম ! আপনাদের রবি ঠাকুরও মিষ্টান্ন, দধির গুণগান করে দু' চার লাইন বিজ্ঞাপন লিখে দিয়েছেন শুনেছি।"

আমি 'তোমাদের বিজ্ঞাপনে' বলেছি সে টি.ভি-র সঙ্গে যুক্ত আছে বলে, কিন্তু সুমন্ত কেন 'আপনাদের রবি ঠাকুর' বলে ঠিক বোধগম্য হয় না, কিণ্ডিৎ ঠেস আছে এটুকু ছাড়া।

"তোমরাও কবিকে নিয়ে কম টানাহ্যাঁচড়া কর না।"

"কী রকম, খুব ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে !"

"তাই ! এই যেমন ইন্দিরা-পুত্র নিহত হলেন। টি.ভি-তে সঙ্গীতের 'প্রবাদ-প্রতিমা' গাইতে বসলেন 'হে মহান···' বা 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু'···"

বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা হচ্ছিল। কথার পিঠে কথা। গড়িয়ে যেতে কবির কথা এল। একজন ফুটবলার বা ক্রিকেটার, নেতা বা ম্যাটিনি আইডল-এর মতো কবিও কি··· পার্থক্য নেই ! না, সুমন্তকে প্রশ্ন করিনি। তার আগে সে বলে, "মিছিলে হাঁটলে বলবেন—মিনার থেকে কবি নেমে এসেছে, সভা-সমিতি করলে হাততালি, দল বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে স্বাক্ষর-সংগ্রহে নিজের সিগনেচার পাশে রাখবেন। শুধু বিজ্ঞাপনের জন্য মন খারাপ হবে কেন ! এটাও একটা ফর্ম···"

"দেখ সুমন্ত, বিজ্ঞাপনে 'জাতীয় সংহতি' আর তাতে কবি ! থাক এ প্রসঙ্গ। তবু বলি, পণ্ডিতজী তাঁর দিনকালে ভারতাত্মার রূপ খুঁজতে বড় বই লিখেছিলেন। তাঁকে কেউ বলতেন 'চ্যাটার-বক্স', কেউ-বা বলেন 'জেন্টেল কলোসাস্'। সম্প্রতি আরেকজন বিদেশে ঘুরে এসে গল্প ফাঁদলেন তাঁকে মেকঙ-পারের কমরেডরা বলেছেন, তোমরা ভারতবর্ষের প্রগতিবাদীরা যদি পণ্ডিতজীর কাঁধে আরেকটু কাঁধ লাগাতে, তাহলে ইত্যাদি···"

সুমন্ত আরেকবার হাসে। এ সময় মুখোশ পরে ঘরে ঢোকে তাতুন, আমার ভাইপো, 'হরর্ আর কমিকস্'-এর জ্যান্ত কিশোর। এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কথা আর এগোয়নি। সে একসময় ওঠে।

সুমন্ত চলে যেতে মুখোশধারী আবার ঘরে ঢোকে। বলে, "জান কাকু, বাজ-পাখি একশ বছর বাঁচে। আমি দেখেছি।" ফের সে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

আমি এক বৃদ্ধকে জানতাম। নব্বই ছুঁয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন।

আমি তাঁর ডায়েরি পড়েছিলাম। গোপন দুঃখের দিনে তিনি ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। এ তাঁর মৌখিক স্বীকৃতি। আর তা পড়ে জানি 'তাঁর সব দিন' তাঁর ডায়েরিতে নেই। তবে কী বিশেষ দিনগুলি—এটা আমার অনুমান। এবং যেসব দিন তাঁর লেখালেখিতে ধরা ছিল তার মধ্যে কবিতা বিশেষের দু-চার পঙ্‌ক্তির উল্লেখ দেখেছি। ঠিক এ ভাবে বললে যথাযথ হবে না ; কবিতা তাঁর ডায়েরির বিবরণে মিশে ছিল। এ ভাবেই অনেক কবি তাঁর দিনপঞ্জীতে ধরা পড়ে। কোনো কোনো কবি একাধিক বার। একদিন তাঁর কাছে হাইনের আবৃত্তি শুনেছিলাম। আর তাঁর লেখা থেকে জানি যখন তিনি অনেক রাত অবধি জাগতেন, বা জেগে থাকতে হতো, তখন তিনি কবিদের দেখা পেতেন। এও এক ধরনের অভিজ্ঞতা যা নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে না। সাদা-মাটা বেঁচে থাকা, অন্তত বাইরের অবয়বে, হেঁচে না ফেলে চলে যাওয়া, ডায়েরি লেখা এবং কবিদের দেখা পাওয়া—এসবই আমাদের প্রথাবদ্ধ ধারণার বিপরীতে আমাদের দিকে কী সব ইশারা করছে।

এ কথাই সুমন্তকে বলেছিলাম। বৃদ্ধের ডায়েরি লেখার কথা। কিন্তু আমাদের আলাপ বিজ্ঞাপনে কবিদের অংশগ্রহণের বিতর্কে শেষ হয়েও হল না। মুলতবী আছে। থাকবে। আবার অন্য কোনোদিন—হয়তো সুমন্তর সঙ্গে নয় বা তারই সঙ্গে। ঘরের আগুনে ঘর, দেশ, যেদিন প্রাসাদ জ্বলবে সেদিন এ বিতর্ক অন্য চেহারা নেবে।

এমন সময় তাতুন আবার ঘরে এল। "জান কাকু, টিনটিন একদিন ভারতবর্ষে আসবে, খুব জলদি।"

"তুই জানলি কী করে ?"

"আমি সব জানি। 'হরর্ আর কমিকস্' পড়লে সব জানা যায়।" সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চোরকাঁটার মতো যে লেখালেখি বিঁধে আছে সেও তো কবিকে নিয়ে। দশ বছর হাঁটাহাঁটি করে শেষে রাজী করিয়েছি। তবে, ষোল পৃষ্ঠার। বলে কী না—আপনার থিসিস কে ছাপবে, মশাই, ঘরে তো হাঁড়ি চাপাতে হবে।

নাটক-নভেল বৃত্তান্তকে থিসিস বলছে। বেটা আহাম্মক। অথচ গল্প-কাহিনীই ছাপে। এসব কথা তো মুখোমুখি বলা যায় না, তবে তো মুখ দেখাই বন্ধ হতো। তবুও তো দশ বছর ধরে হাঁটাহাঁটির সুযোগ পেয়েছি। শেষে ষোল পৃষ্ঠা মঞ্জুর, তবে নাটক-নভেল—ঐ থিসিস চলবে না। দশ বছর ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটা সখ্যতা জন্মেছে। তারই স্বীকৃতি ঐ ষোল পৃষ্ঠা। বলেছি—আমার ট্যাবলোটাই ছাপান—'ডাকঘর' নাটকটি। ভদ্রলোক বিষম খেয়েছেন। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে বলেছেন—'ডাকঘর' ? শেষে জেল খাটাবেন নাকি ?

—আসলে কী জানেন, এটা তাঁরই 'ডাকঘর' নাটকের পুনর্লিখন। তাই নামটা পালটাইনি।

—এটা আপনি 'বিশ্বভারতী'তে জমা দিন।

—ঠিকানা জানা নেই, শান্তিনিকেতনে কোনোদিন যাইনি। যদিও একসময় কাছেই থাকতাম।

—বলেন কী মশাই! বাঙালীর ছেলে, লেখালেখি করার ইচ্ছে আছে, অথচ···

এখন এইসব বাক্যালাপ আমি কিছুটা মনে করতে পারছি।

তাতুন আবার উঁকি মেরেছিল। আমি নিভৃতে আমার প্রকাশককে স্মরণ করি, বলি, বয়ঃসন্ধিকালে এই 'ডাকঘর' নাটক পড়েই আমাদের কবির প্রতি আমার ভীষণ অভিমান হয়েছিল ; সেই থেকে ঠোঁট ফুলে আছে।

সুধার প্রবেশ

সুধা

অমল।

রাজকবিরাজ

ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা

আমি যে তার জন্য ফুল এনেছি—তার হাতে কি দিতে পারব না।

রাজকবিরাজ

আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা

ও কখন জাগবে।

রাজকবিরাজ

এখনি যখন রাজা এসে তাকে ডাকবেন।

সুধা

তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে ?

রাজকবিরাজ

কী বলব।

সুধা

বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলেনি।

প্রকাশকমশাই, এ কথাটাই অমলকে বলার দায়িত্ব আছে। তাই পুনর্লিখন। এর জন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হবে কেন ? একে কি স্পর্ধা বলে···যদি তাই হবে তবে সুধাই সেই স্পর্ধা দেখিয়েছে। কেননা সে বিশ্বাস করেছিল অমল আবার জেগে উঠবে। অথচ কত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মো। কবি নিজেই যে ঠাকুরদার চরিত্র গড়েছিলেন, তাঁর কাছে কবি নিজেই কখন হার মেনে বসে আছেন। তাই···

আর আপনি একদিন তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন, ষোল পাতার একখানা ঠাসা ভ্রমণ-কাহিনী লিখে দিতে। অথচ আপনি জানেন না লেখা মাত্রই ভ্রমণ। জার্নি। যে থেমে থাকে তার হাত থেকে কলম ছিটকে পড়ে।

হোক না ষোল পৃষ্ঠার, তা বলে এ সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। চটি বই, তাতে কী, চটিজুতোও কী কম কাজে লাগে? সুতরাং ঠাসা ভ্রমণ-কাহিনী—মন্দির-মসজিদ, মঠ-বিহার, দুর্গ-প্রাসাদ, স্থাপত্য-কলা, পাহাড়-সমুদ্র, নদী ও প্রকৃতি, মানুষ-জন, খাবার-দাবার, রেশমি চুড়ি বা পাথরের মালা, গামছা—'মহাপ্রস্থানের পথে' যেতে যেতে রাণীর সঙ্গে দেখা হলে···ঠাসা হওয়া চাই। কিন্তু বেয়ারা আমার স্বভাব—পথের পাশে পাথরের মালা দেখার ধৈর্য নেই, রাণীর দেখা পেলে বলতে পারি (কী বলতে পারি!)··· তবে ঠাসাঠাসি ট্রেনের কামরায় দুঃখী মানুষ কী ভাবে আমের খোসার আচার দিয়ে বিরল তৃপ্তিতে বাসি রুটি খায় এসব লক্ষ করেছি; ঐ সমুদ্রের ঢেউ বার বার ঘুমের মধ্যে আমার ওপর আছড়ে পড়েছে। প্রাচীন চাঁদ ও বালিয়াড়ি, অচেনা পাখি বা লম্বা দড়ি, ঠিকই, যা ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে আসে, এ সবকিছুই আমাকে আগামী দিনের সংকেত জানিয়ে যায়। এবং দুর্গবাড়ি তাকে ঔরঙ্গবাদ থেকে ইলোরার পথে যেতে যেতে দেখি বা না দেখি, তার চেয়েও রহস্যময় কিছু আমি কলকাতাতেই পেয়ে যাই। একবার আমি বন্দী হয়েছিলাম। কোর্ট লক-আপ থেকে ক্যাসেলের ধ্বংস পথ ধরেই আমাকে হুজুরের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। তখন ভ্রমণের ঐ দুর্গবাড়ি আমার কাছে খেলনা সদৃশ মনে হয়। তথাপি আমি ছায়াবিহীন অবস্থায় কাউকে বলিনি—তফাৎ যাও! চোর, খুনী, প্রেমিক বা জোচ্চোর সকলেই হুজুরের কাছে তাদের ছায়া ফিরিয়ে দেবার জন্য যার যার মতো···

ছায়া ফিরে পেয়ে ভিড়ের মধ্যেও নিজেকে আড়ালে রেখেছি। এবং দিনের শেষে বিরল তৃপ্তিতে মদ ও রুটি স্পর্শ করেছি। আমার রেশন।

এসব চলবে?

নাকি কেল্লার অ্যাডভেঞ্চার বা মায়া-দ্বীপের কথা! যদি সীমান্ত-যাত্রার কথা বলি তবে আউট পোস্টে নির্ঘাৎ এক কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলব।

কেননা কবিরা আউট পোস্টে থাকেন। এই তার অন্তিম অবস্থান। চূড়ান্ত। নির্ধারিত। (বেয়াড়া) আমার বিশ্বাস। এবং আহ্লাদে ভাবি, চটি বইটা এক কবিকেই উৎসর্গ করব।

তোমাকে দিলাম—দশ বছর হাঁটাহাঁটির সুবাদে এই বিরল সুযোগে, শুধু তোমাকেই দিলাম—

কিন্তু কোন কবিকে—

কফির আড্ডায় সেই যুবা যে কিছুসময় সঙ্গ দিয়ে উঠে যেত; দরজার কাছে গিয়ে কিছু ফেলে গেছে এমন মুখ করে ফিরে এসে কানের কাছে বলত, চার আনা হবে? আমাকেই। আড়ালে গিয়ে তাকে ২৫ পয়সা দিতাম। সে আড়ালই পছন্দ করত।

পঁচিশ পয়সা। কম কী! তখন সোনার দাম ছিল—মনে নেই। এখন চার হাজার টপকে গেছে। তখন তিন টাকায় এক কে. জি চাল আর এক শিলিং ৭০/৮০ পয়সা হিসাবে ১০/১৫ শিলিং-এ হাইনে—রিলকে—ব্রেশ্‌ট্‌ পাওয়া যেত। সেই খুনী

ফরাসী লেখকের নাটক, সার্ত্র যাকে সস্ত বলেছিলেন। এখন কাঁচালঙ্কার দর মাঝেমধ্যে ২৫ টাকা কে. জি-তে ওঠে। আর জীবনানন্দ দাশ বা মানিক…

সেই যুবা কবিতা লিখত। কেমন অ্যানিমিক শরীর নিয়ে চলাফেরা করে। একদিন সর্বোচ্চ এক টাকা চাইল। দিলাম। খুশীতে জানাল কাল সারারাত কবিতা লিখেছে। এবং ভোররাতে জ্ঞান হারিয়েছিল।

—তবে আজ পথে কেন।

—এখানে না আসলে মন ভাল থাকে না।

অনেকদিন তাকে পাইনি। একদিন পথেই দেখা। জানাল, মন ভাল নেই।

আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি। কেননা শিল্পের যেমন সুষমা, তেমনি কবিদের মন ভাল রাখতে হবে। ক্রোধ নয়, হতাশা নয়, বা কোনো অভিসন্ধি—তাকে নিষ্পলক প্রশান্তিতে (তাও কি সম্ভব) কবিতাকে সেই আউট পোস্ট থেকে গড়িয়ে দিতে হবে দুর্বার গতিতে, কখনো বা মন্দ মন্থরে…

না কি মানিক-কে। সূত্র সেই চার আনা পয়সা। তবে বলি, বন্দ্যোঃ যেদিন মারা গেলেন সেদিন তাঁর পরিচিত আরেক কবির অনুযোগের উত্তরে মানিকের স্ত্রী জানান, স্বামীর নিদারুণ অসুস্থতার কথা পাবলিক ফোন থেকে জানাতে গেলেও যে তাঁর চার আনা পয়সার দরকার ছিল!

জীবন কিছু দাবী করে। চার আনা পয়সার সূত্রেই রক্তের মতো জমাট অন্ধকার আর আলো হাতড়ে তাকে পা ফেলতে হয়…সন্তর্পণে…কখনো শুধুই অপেক্ষা…কী, কেমন বুঝছেন, প্রকাশকমশাই।

তাতুন আবার ঘরে এল। তাক থেকে পিস্তল নামিয়ে বলল, "জান কাকু, বাজপাখি শিকারী; কিন্তু ওর চোখ জোনাকপোকার মতো সফট্। আর উড়িষ্যার মন্দিরে দেখেছি মহাকালের জোড়া-চোখ ঠিক মরুভূমির দস্যুর মতো। বড় বড়। ভয় করে", অনর্গল এইসব বলে পিস্তল তাক করে।

আমি রহস্য করে বলি, "মহাকালকে?"

সে এক কথায় রা না করে শুধু জানায়, ঐ মহাকালের চোখ জোড়া সে উপড়ে আনবে। তার চাই।

—আমার চাই। সেই দামাল কবি বলেছিল। ভাষা চাই, ভঙ্গি চাই। বিদ্ধ করার জন্য ব্যঞ্জনা—বসন্তের মাতাল বাতাসের সঙ্গে পৌষের অটুট ইশারা। তার ঠোঁট চুইয়ে রক্ত পড়ছিল, একটা স্ট্রীট অপারেশন থেকে ফিরছে। অনুমান, গ্রেনেডের মুখে শক্ত তার দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে গিয়ে এইসব রক্তটক্ত…

সে নিজেই বলেছে, পালিয়ে আসিনি। পুলিশ-মিলিটারি রিট্রিট করতে আমরা ডিসপার্স করলাম। একটা শহীদ বেদী ভেঙে ফেলেছিল। আমরা নতুন করে গড়েছি। ওরা আসবে শুনে দুপুর থেকে আমরা দুটো স্ট্রীট, তিনটে বাই-লেন ও একটা লেনের মুখে ব্যারিকেড করে পজিশন নিলাম। পাক্কা চল্লিশ মিনিট হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। আমাদের

ক্ষয়ক্ষতি সামান্যই হয়েছে। চারদিকে জনবসতি, সেই সুযোগটা আমরা নিয়েছি।
—ভাল কথা ; কিন্তু মাস্ রি-অ্যাকশন কী ? শ্রমিক আর শহুরে গরীবগুর্বোরা কি সাড়া দিয়েছে ?
—গেরিলা স্কোয়াডের কাজই তো সঠিক কারণে অ্যাকশন করা, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
—কিন্তু এই অ্যাকশন অন্যান্য অংশকে যদি সংগঠিত না করে ?
—অন্তত উৎসাহ পাবে, বল-ভরসা পাবে।
—কিন্তু এই উদ্দীপনা প্রতিদিনের জীবনে, বৃত্তিতে, নানা স্তরে যদি দানা না বাঁধে ?
এ কথায় ঋতবান আমার দিকে কেমন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু আমি জানতাম সে আমাকে বিশ্বাসই করে। না হলে সেই রাতের জন্য শেলটার নেবে কেন।
রাতে একই বিছানায় আমি আর ঋতবান, অনেকটা প্রাকৃতিক নির্ভরতায় সে ঘুমিয়ে পড়েছে। জানতাম আমার ঘুম ভাঙার আগে খুব ভোরে চা না খেয়েই সে এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। এমনটাই ওর চলাফেরার ধরন। মা একই ঘরে পাশের খাটে শুয়ে জেগে আছেন। স্বচ্ছ অন্ধকারে তার জেগে থাকার উৎকণ্ঠা (আমারও) বেশ অনুভব করেছি। মার বুকে কি স্বদেশী কোনো গান গুনগুন করছিল, (এই সেদিন পর্যন্ত তো তিনি আপনমনে, আনমনে গান গেয়েছেন) না কি ছোটখাট কোনো আকিঞ্চিৎকর শব্দে তিনি কান পেতেছেন, ও কিছু নয়, তিনি এবারে ঘুমোবেন। পাশের ঘরে তাতুন ওর বাবা-মার সঙ্গে। ঋতবান আসতে সে তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেয়েছিল। দুটি হাত ধরে বলেছিল—তোমার গায়ে বারুদের গন্ধ। ঋতবান হেসে বলেছে —বাতাসে।
সেই রাতে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল। হ্যাঁ, এভাবেই বলতে হয় বিষণ্ণতায় ঠাসা বিশ্রী ব্যাপার-স্যাপার…
মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে তাতুন চিৎকার করে ওঠে। সেই কৈশোরিক আর্তনাদ মধ্য-রাত্রির উৎকণ্ঠাকে বিজড়িত করে যেন সকলকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিতে চায়। আর পরিবারের সকলে, ঋতবান সমেত, ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠে কিছুক্ষণের জন্য কেমন স্থাণু হয়ে পড়ে। এবং সেই বিহ্বল অবস্থার মধ্যে মা ও বৌদি টের পান যে তাতুনের গা পুড়ে যাচ্ছে। ঘুমে বা স্বপ্নে সারা শরীরে আগুন লেগে গেলেই এইরকম তাপ সারা দেহে সঞ্চারিত হতে পারে।
—পাঁচ ডিগ্রি।
বালতি বালতি জল এল। এখন তা তাতুনের মাথায় ঢালা হচ্ছে। মা ওর কপালে জলপট্টি পাল্টে দিচ্ছে। বৌদি চৌকোণা একটা মাঝারি টিনের বাক্সে ক্রোসিন খুঁজছিল। টিনের বাক্সটি, যা বস্তুত তাতুনেরই জন্মদিনে উপহার সূত্রে পাওয়া প্যারী কোম্পানীর লজেন্সের বাক্স—এখন এ সংসারের মেডিসিন-ব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে। নানা ধরনের ট্যাবলেট যা বিভিন্ন সময়ে কেনা হয়েছে—কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অবশিষ্ট জমে ওঠা ওষুধে বাক্স ঠাসা। এর মধ্যেই থার্মোমিটার থাকে যা কিছু আগেই ব্যবহার করা

হয়েছে। কিন্তু ক্লোসিন কোথায়…কাঙ্ক্ষিত ওষুধটি না পেয়ে বৌদি ক্রমেই নার্ভাস হয়ে পড়ছে, সে খেয়ালই করেনি যে বাক্সটি থেকে সে যে দু-চারটি ট্যাবলেট নামিয়ে টেবিলে রেখেছে তার একটিই প্রার্থিত ক্লোসিন! বৌদি যতই নার্ভাস হয়ে পড়ছিল ততই সে নানা ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। তার মনেরই কথা, কিন্তু ঘটনা না ঘটলে কোনোদিন প্রকাশ পেত না। কাঙ্ক্ষিত ক্লোসিন না পেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঋতবানের দিকে সেই সব ইশারা ছুটে আসছে।

সে অমঙ্গল। সে জলজ্যান্ত অশুভ। তাই সে অনাকাঙ্ক্ষিত।

তাতুনের আর্তনাদেরও ভাষাগত অবয়ব ছিল। সকলেই জেনেছে যে তার দহন ঋতবানকেই লক্ষ্যভেদ করে!

আমি টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এবং টেবিলের ওপর রাখা দু-চারটে ট্যাবলেটের মধ্য থেকে ক্লোসিন উদ্ধার করি। এবং 'ইট'স টু মাচ'—এ কথা বৌদিকে বলার আগে সে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে, যা কী না সৌজন্যই বা আমাদের দৈনন্দিন আচরণের এক জরুরী শীল যা ভারসাম্য রক্ষা করে। এর আগে অর্থাৎ জরুরী ট্যাবলেটটি পাবার আগের মুহূর্তে দাদা তাঁর চোখের ভাষায় বৌদিকে ভৎর্সনা করেছে এবং মার মৃদু 'আঃ বৌমা—' এসব কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারেনি।

কিন্তু কোন রসায়নে তাতুন ঋতবানকে তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করেছে এই অন্তর্দন্ত হবার আগে সেই সন্ধ্যায় ঋতবান বনাম তাতুনের কথালাপের কিছু অংশ শোনা জরুরী।

—তুমি এলে—

—এলাম—

—আমার হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার সময় একবার এসেছিলে।

—তোমার মনে আছে, আমার নামটা—

—তুমি ঋতবান, তোমার গায়ে বারুদের গন্ধ।

—বাতাসে—

—বাতাসে কেন?

—বুলেটগুলো সব ফুল হয়ে ফুটছে।

—বুলেট…ফুল…বেশ মজার। তুমি পিস্তল এনেছ?

—আমার পিস্তল নেই।

—আছে, আমি জানি—

—জান। তাহলে আছে। এখন নেই, কাছে।

—আমাকে দেবে।

—তোমারও তো একটা আছে।

—সেটা টয়। আমি আসল একটা চাইছি।

এ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু কিছু পরে—

—টিনটিন একদিন ভারতবর্ষে আসবে। ইন্ডিয়া, এ গ্রেটল্যান্ড অব ম্যাজিক।

—না, আসবে না।
—আমি বলছি আসবে। হি মাস্ট কাম।
—দেবে না—
—দেবে না। কে? তোমরা কে? তাতুন ঋতবানের কর্তৃত্ব বা আইডেনটিটির প্রশ্ন তোলে। প্রশ্নের মধ্যে অবজ্ঞা আছে।
—দেশের লোক। ঋতবান বলে।
—তোমরা কিসস্যু না। হরর্ পড় না, কমিকস্ পড় না।
ঋতবান হেসে ফেলে। বলে, তুমিও আর পড়বে না।
—কী পড়ব? রাস্তার হোর্ডিং না দেওয়ালের লেখা!
—তুমি রূপকথা পড়বে, দেশ ও দশের ইতিহাসের গল্প।
—সেসব কোথায়? সেসব কোথাও নেই।
ঋতবান নীরব হয়ে যায়। তাতুন ওর কথার পুনরাবৃত্তি করে।
—তোমরা কিসস্যু না। হরর্ পড় না, কমিকস্ পড় না। সেসব কোথাও নেই।
তাতুন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে ঋতবানের দিকে আঙুল তুলে বলে, হি মাস্ট কাম!
ধমক-খাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারে তাতুন কিছুটা ব্যতিক্রম, হয়তো বা তার ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সুবাদে। এটা ভাল-মন্দর কথা নয়, স্বাতন্ত্র্যের কথা এই যা—
এবারে মাঝরাতে—
—হি মাস্ট কাম। (তাতুন)
—আসবে, আসবে! (দাদা)
—আসবে রে, আসবে! (মা)
—সার্টেনলি, মাই ডিয়ার। (বৌদি) (এরকমটা তাতুন তার মাকে শিখিয়েছে।)
—হি মাস্ট কাম।
—আসবে রে, আসবে। (মা)
—আসবে···। (দাদা)
—সার্টেনলি, মাই ডিয়ার। (বৌদি)
তাতুনের গলায় প্রত্যাশা-দীর্ণ ঘোষণা ও কোরাসের মতোই তার প্রতি সমবেত সমর্থন এই প্রক্রিয়া চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ক্লোসিন খাওয়ার সুবাদে ও মাথায় অবিরত জলের দরুন তার শরীরের তাপ নামছিল। আরও কিছু পরে তার শরীরে ঘামের ধারা নামে। তখন অনুত্তেজিত সে বলে—ঋতবান, তুমি চলে যাও। খুব স্পষ্ট অভিব্যক্তি। যে কথা দাদা, বৌদি কেউ বলতে পারে না, সে কথাই তাতুন বলে।
পাশের ঘরে ঋতবান জেগে উঠে অপেক্ষা করছিল। এমন অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তার মস্তিষ্কে চিন্তা-তরঙ্গ এখন শূন্যতে অবস্থান করছে। মুখাবয়বে ও দৃষ্টিতে সেই আভাস স্ফুট। তখনো রাত্রি অবশিষ্ট ছিল এবং অন্ধকার। তাতুনের মুখোমুখি

হবার কোনোরকম সাহস সে দেখাল না, সৌজন্য বা মানবিক কাতরতা যাতে অসুস্থ তাতুনকে দুদণ্ড দেখেশুনে, তার পাশে বসে কপালে বা মাথায় হাত বুলিয়ে যে একটা সম্মানজনক (উভয়ত) বিদায় নিতে পারে এমন কোনোচেষ্টাই সে করল না। বরং আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে এবং অন্য সকলের অগোচরে নিঃশব্দে সে অন্ধকারেই পা বাড়াল।

ভোরবেলায় ডাক্তার আসে। তখন তাতুন স্বাভাবিক। সে ঋতবানের খোঁজ করে এবং চলে গেছে শুনে কেমন আনমনা হয়ে পড়ে। এই শেষ। আর কোনোদিন ঋতবানের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। জিজ্ঞাসা করা হয়নি সে কি সেদিন তাতুনের তাপাক্রান্ত ব্যবহারে খুব আহত হয়েছিল। কেননা সময় বিশেষে ঘটনা যুক্তির চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে—এমন কথা আমরা দর্শন থেকে জেনেছি।

কিছুদিন পরে আমার হাতে একটা লিটল ম্যাগাজিন আসে। পাতা উল্টোতে উল্টোতে এক রহস্যময় গদ্যের ওপর আমি আছড়ে পড়ি। 'সার্ত্র পড়ার কুফল' এই শিরোনাময়। লেখকের নামের জায়গায় ছাপা আছে : একটি নৈর্ব্যক্তিক গদ্য।

॥ সার্ত্র পড়ার কুফল ॥

এক বৃষ্টি-বন্দী সন্ধ্যায় লর্ড সিনহা রোড থেকে আমার ডাক আসে। আমি ঘাবড়ে যাই। আমাদের বাড়িতে চারটে রঙিন কুকুর আছে। বেলা হলে ওরা জেগে উঠে ভোরের দৈনিক চাটে। ওরাও ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। দারুণ ইনটুইটিভ। আমি বাপীর কাছে সারেন্ডার করি। বাপী ও মা এই প্রথম আমাকে তাঁদের গ্রিপ-এ পায় এবং এতটুকু ডিসটারবড্ না হয়ে আমাকে অ্যাডভাইস করে লর্ড সিনহা রোডে হাজিরা দিতে। তাদের আচরণ রীতিমতো রহস্যজনক মনে হয়।

আমি বাপীর গাড়ি চেপে লর্ড সিনহায় যাই। দোতালার ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে হলুদ সিল্কের পুলওভার গায়ে বা তাকে হাতাওয়ালা গেঞ্জিই বলা চলে, চোখে কালো রোদ-চশমা (বৃষ্টির দিনে) এক ব্রাইট ইয়ং ম্যানের মুখোমুখি টেবিলের এপাশে আমাকে বসতে হলো। অনেকটা টিভি প্রোগ্রামের মডারেটর গোছের বা সেলস্ এক্সিকিউটিভদের চেয়ে এককাঠি সরেস—প্রথম দর্শনে এমন মনে হলো।

'কফি—'

আমি ঘাড় নাড়লাম। এখানে কোনো থার্ড ডিগ্রি মেথড যে আমার জন্য অপেক্ষা করে নেই এমন একটা মনগড়া নিশ্চয়তায় (এমন ভাবনার ব্যাকগ্রাউন্ডে বাপীর মুখটি ছিল) আমি কিছুটা স্মার্ট হবার জন্য চেষ্টা করছিলাম।

কফি এল। প্রথম চুমুক দিতেই, বাইরে টানা বৃষ্টি, সে স্টেট এক্সপ্রেস বাড়িয়ে দিল। নিজেও একটা ধরাল।

"আপনি অ্যাকাডেমিক পড়াশুনার বাইরে কী পড়াশুনা করেন তার একটা অনেস্ট

রিপোর্টিং করুন।"

মনে হলো পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেরায় নয়, যেন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ইউ. পি. এস. সি-র কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডের মুখোমুখি বসে আছি। (রাগী ছোকরা তখন ক্ষুধার্ত চাকুরীপ্রার্থীতে পরিণত)। সামান্য হাসি পেল; কিন্তু হাসবার উপায় নেই। ইন্দ্রনীলের কথা মনে হলো যে তাদের সামনে চুপ করে বসে থাকতে নেই, তাহলে ওরা ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে।

—"সমরেশ থেকে অবধূত।"

—"বিদেশী সাহিত্য। হিস্ট্রি। ফিলসফি ও পলিটিকস?"

—"সার্ত্র, স্যালিঞ্জার-জেনে' জেমস্ বলডুইন থেকে ফ্রনৎস ফ্যানোন। হার্বার্ট মারকুইস্ থেকে রেজিস দেব্রে, চে গুয়েভারা।"

—"সার্ত্র, এঙ্গেলস, লেনিন-স্ট্যালিন বা মাও?"

—"থিওরি অফ্ সারপ্লাস ভ্যালু অংশত আমার কলেজ পাঠ্য, এঙ্গেলস-এর চিঠি, লেনিনের কবিতা ও লিনের 'লঙ লিভ দ্য ভিক্টরি অব্ পিপলস্ ওয়ার' বা রেডবুক।"

"মাওয়ের হুনান রিপোর্ট পড়েননি?" চোখ থেকে কালো চশমা নামিয়ে রাখে।

টানা বৃষ্টির মতই এক দীর্ঘ ইন্টারভিউ আমাকে ক্লান্ত করে, আমার সজাগতাকে ভোঁতা করে দিয়ে আমাকে বিষণ্ন করে তোলে এবং এসবের মাঝে রুশ, চীন, ল্যাটিন আমেরিকার লড়াইয়ের এক সংবাদধর্মী সামারি তুলে ধরে সে জানতে চায় কোনটা ভারতবর্ষের পক্ষে অ্যাপ্লিকেবল—চীন না ল্যাটিন আমেরিকার পথ। আমার কী ধারণা ইত্যাদি।

এরই মাঝে সে আমার বন্ধুদের যারা রাজনীতির সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত তাদের খোঁজখবর জানার চেষ্টা করে। দু-একটা নাম সে জানেও। আমি বলি, "ওদের সঙ্গে আমার ক্যাজুয়াল ওঠাবসা ভাবগত, কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই।"

"ইয়েট, ঋতবান নামে যে ছেলেটি কবিতা লেখে এবং ফায়ার আর্মস নিয়ে মেট্রোপলিসের ডিফারেন্ট স্পটে অ্যাকশন লিড্ করছে তার শেলটারের জায়গাগুলো কেমন হতে পারে?" এমন বে-আব্রু প্রশ্ন করে সে তার চোখ দিয়ে আমাকে ড্রিল করতে থাকে। এই সময় মাথার ওপর হাজার পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে ওঠে।

"বলুন, আপনি রেসপেক্টেবল্ ফ্যামিলির ছেলে। বাড়িতে বাবা-মা-বোন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে যেতে আগ্রহী!"

আমি বলতে থাকি…

"প্লিজ প্রসিড ফারদার…"

"বেনেপুকুর-নোনাতলার যে গ্রেভইয়ার্ডের সামনে কলকাতা কর্পোরেশনের প্লেগ সম্পর্কে একটা হোর্ডিং সেদিন পর্যন্ত কী ভাবে যেন টিঁকে ছিল, সেখানে ওর খুব… রাত হলে মাঝে মাঝে সে ওখানে শেলটার নেয়।"

"মাইকেলের…" উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়ায়। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে সে ঘর

থেকে ঝোড়ো হাওয়ার মতো বেরিয়ে যায়।
আমার সামনের টেবিলের কাঁচে পেছনে দাঁড়ানো সেন্ট্রর ছায়া নড়াচড়া করে।
হুররে—এই আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এই ধূসর পুলিশ যুবকটিকে বোকা বানাতে পেরেছি বলে। পরক্ষণেই মনে মনে আমি নতজানু হয়ে, জীবনে এই প্রথম, অতিপ্রাকৃতের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাই—দোহাই, সার্ত্র-এর 'দ্য ওয়াল' গল্পের 'আমি' চরিত্রটির মতো আমার অবস্থা যেন না হয়—যে মিথ্যে বলেছিল যে কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবী নেতাটি গ্রেভইয়ার্ডে লুকিয়ে আছে। অথচ সেই মিথ্যে খবরের পেছনে ছুটে রাষ্ট্র সত্যিসত্যিই নেতাটিকে সেখানে পেয়ে যায়। 'আমি' চরিত্রটিকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয়নি। কিন্তু জেলখানায় এক সদ্যবন্দীর কাছে গ্রেভইয়ার্ডে নেতাটির গ্রেপ্তারের কথা শুনে 'আমি' আর্ত হাসি ও কান্নায় আছড়ে পড়ে।
অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসি। আমাকে বসিয়ে রেখে লর্ড সিনহা হয়তো গ্রেভইয়ার্ড অভিযানে বেরিয়েছিল। বাপী ও মা আমার সম্পর্কে এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাড়ি ফিরতে কুকুরগুলো শুধু এগিয়ে এল। ওরা জানত না আগামী ভোরে খবরের কাগজের পাতায় ওদের জন্য সত্যিই কোনো ভোজ থাকবে কিনা। আমিও না।
ভোররাতের ময়দানে ঋতবানের বুক ও মাথা আলাদা হয়ে যায়। দৈনিকে এ খবর ছিল না। যেটুকু জানাজানি হবার সম্ভাবনা ছিল তাতে কলকাতার জ্ঞানীগুণী কলাকুশলীরা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। বুক ও মাথার পরিচয় যে একজন কবি ও কর্মীর তাকে পরিচয়হীন গোত্রহীন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রইল॥ কিন্তু ঘটনাটা একদিন ঠিকই গল্প হয়ে গেল।
এই আমার স্বীকারোক্তি।
যখন তা ছাপা হবে তার অনেক আগেই আমি ইওরোপ পাড়ি দেব। ওঁ গুরুঃ কৃপাহি কেবলম্।

প্রকাশকমশাই, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ঋতবান নামে প্রকৃতই এক যুবক ছিল। সে বাস্তবিকই সারাক্ষণের এক কর্মী ও কবি হয়ে উঠছিল—যার বুক ও মাথা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সব কালেই এমনটি হয়ে আসছে। শুধু বাইরের মৌলুসি শক্তিই যে কবির বুক ও মাথা আলাদা করে দেয় এমন প্রতিপাদ্য আমার নয়। বরং আমাদের (কবিরও) চিন্তা ও অনুশীলনের গৌণ ভ্রান্তি, যাকে অন্তর্ঘাতও বলতে পারি, তাও কবির বুক ও মাথাকে বিচ্ছিন্ন করে।
এমনই এক অন্তর্ঘাতের ফলে 'ডাকঘরের' অমল ঘুমিয়েছিল। তখনই সুধার প্রবেশ। আমরা সুধাকে কী বলব? □